কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না

সাগরিকা রায়

অরণ্যমন প্রকাশনী

ভূ মি কা

সাধারণত থ্রিলার লেখার মধ্যে একটা উত্তেজনা কাজ করে। আপাতদৃষ্টিতে সেই অস্থিরতা বাইরে দৃশ্যমান না হলেও ব্রেনের হার্ডডিস্ক অবিরত কাঁপতে থাকে সাসপেন্স, ভয়, ফ্যান্টাসি, বাস্তবতার সঙ্গে মিলেমিশে শরবত হয়ে যাওয়ার তাগিদে। 'কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না' বইটিতে *কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না* নামের একটি ক্রাইম থ্রিলার উপন্যাস ও *চাঁদ ডুবে গেলে* নামের একটি ক্রাইম থ্রিলার উপন্যাসিকা রয়েছে। বইটি প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ জানাই অরণ্যমন প্রকাশনী ও তার কর্ণধার চিরঞ্জীৎ দাসকে। অপরাধ ও অপরাধী এই বইয়ের মূল উপজীব্য বিষয়। পাঠকের হাতে বই তুলে দিলাম। তাঁরাই বিচারক।

সূ চি প ত্র

১১
চাঁদ ডুবে গেলে

৫৭
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না

চাঁদ ডুবে গেলে

চেয়ারটা বেশ পছন্দ হল বদর আলির। পছন্দ হওয়ার মতোই চেয়ারটা। এই ধরনের চেয়ার দেখেছিল উলুবেড়িয়ার সুকুমারের কলকাতার অফিসে। সেই চেয়ারের থেকেও এটা ভালো বলে মনে হল বদরের। মন দিয়ে চেয়ারটা দেখছিল ও।

গদি-আঁটা চেয়ার। দুই পাশে পোক্ত হাতল। ঘন কালো বার্নিশ করা চেয়ারের পিঠের ওপরে দামি তোয়ালে। বদর চেয়ার দেখতে দেখতে মনে করতে পারল সুকুমারের অফিস ছাড়াও এরকম একটা চেয়ার দেখেছিল গোবিন্দ সাহার সোনারপুরের অফিসে। অফিস বলতে বিজনেস পারপাসের একটা দুই রুমওয়ালা ঘর। তখন গোবিন্দ সাহার রাইস মিলের সর্বক্ষণের স্টাফ বদর। সব দেখাশোনা করার দায়িত্ব নিয়ে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে। ওর কাজে খুশিই সাহা। একদিন পাঠাল ডায়মন্ড হারবারে। সাহা সেখানে জমিয়ে প্রোমোটিং চালাচ্ছে। সেই প্রথম ডায়মন্ডের অফিস রুমটা দেখল বদর। সেখানেও ওর চোখ আটকে গেল গোবিন্দর বসবার চেয়ারের দিকে। আহা, কী চমৎকার চেয়ার! একই সাইজ, শেপ, কালার।

চেয়ারটা দেখে আর ভক্তিতে মাথা নত হয়ে আসে বদরের। সেদিনই সোনারপুরে ফিরে আসার কথা, কিন্তু ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নেমে যান চলাচল বন্ধ থাকায় সেদিন ফেরা হল না। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কাকদ্বীপ আর কলকাতার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ।

উপায় কী? বদর কলকাতায় ফেরে কী করে?

সাহা আশ্বাস দিল, "একটা তো রাত। এখানেই থাকতে হবে। কাল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফিরে যাবে। এত দুশ্চিন্তার কী আছে? পুরুষমানুষ। যেখানে রাত, সেখানেই কাত। তুমি কি মেয়েছেলে নাকি হে?"

অগত্যা অফিসেই রাতটুকু কাটানোর ব্যবস্থা হল। গোবিন্দ সাহা কাছের হোটেলে থাকবে। বদর অফিসের ভেতরে দুটো বেঞ্চ জোড়া দিয়ে কাটিয়ে দেবে। এই রকমই ব্যবস্থা হল।

রাতে সামনের পাইস হোটেলে রুটি-ডিম তড়কা খেয়ে অফিসে শুতে গিয়েছে বদর। তাড়াহুড়ো করেই শুতে গেল। বাইরে থাকা ঠিক নয়

বিবেচনা করেছে বদর। যেখানে আছে ও, এই এলাকায় জোয়ারু গ্রামের কয়েক জন হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, রাস্তা সারাই ইত্যাদিতে কাজ করে। তেমন কারও মুখোমুখি হতে চায় না বদর আলি। কে দেখে ফেলবে, তার দরুন সাংঘাতিক নাজেহাল হতে হবে। চাইলে ছোরাছুরি চালিয়ে দেওয়াও ওদের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিছু কিছু মানুষ থাকে, যাদের কাছে মানুষকে মেরে ফেলা খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু একটু সুযোগ আর ছুতোর দরকার। যেমন সেদিন একটা কাণ্ড হল। গিয়েছিল বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। ফিরে আসার সময় মেট্রোতে উঠবে বলে ভেবেছে। মেট্রোতে সময়টা বেঁচে যায়। তো বদর কলাবাগানের মধ্যে দিয়ে যাবে বলে পা বাড়াতে এক অবাঙালি ভদ্রলোক ওকে পিছু ডেকে বললেন, "এই রাস্তা কি আপনার চেনা? আগে কখনও গিয়েছেন এই রাস্তা দিয়ে?"

বদর অবাক হয়েই তাকিয়েছে ভদ্রলোকের দিকে। সাদা শার্ট আর কফি কালারের ফুলপ্যান্ট পরা অবাঙালি ভদ্রলোক ওকে এই রাস্তা সম্পর্কে এভাবে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

ভদ্রলোক ওর চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝে ফেলেছেন মনের কথাটা। একটু ইতস্তত করে বললেন, "এই রাস্তাটা ভালো নয়, ভাই। যেমন নোংরা, তেমনই বদ। পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া শুরু করবে। তারপর টাকাপয়সা কেড়ে নেবে। আমার অভিজ্ঞতা বললাম আর কী! যাকে দেখি ওদিকে যাচ্ছে, তাকেই সাবধান করি।"

বদর বুঝতে পেরেছে ভদ্রলোকের কথাটা। ও ধন্যবাদ গুছিয়ে দিতে না পারলেও হাতজোড় করেছে। তারপর ভদ্রলোকের দেখিয়ে দেওয়া রাস্তা দিয়ে মেট্রোর উদ্দেশে রওনা হয়েছে। পায়ে পা লাগিয়ে ছুতোনাতায় ঝামেলাবাজদের ও ভয় পায়।

এখন দ্রুত অফিসের বারান্দায় উঠে কোলাপসিবল টেনে দিল। তালা পরে দেবে। ওয়াশরুমটা বাইরে। ফাইনালি শুতে যাওয়ার আগে হাতমুখ ভালো করে ধুয়ে শুতে যাওয়ার অভ্যেস বদরের। ও ঘরে ঢুকে একটু বসল বেঞ্চের ওপর পা তুলে। ঘরের দুটো জানালা বন্ধ বলে গুমোট ঠেকছে। কিন্তু বদর জানালা খুলে হাওয়া খেতে কি পারবে? তার কারণ আছে। যে সে কারণ নয়, জবরদস্ত কারণ যাকে বলে।

বহুদিন আগের এক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওর ভাই জড়িত ছিল। পরকীয়া কেস। মহিলা বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল। ব্ল্যাকমেইল করছিল মনে হয়। মহিলাকে পরে খুন করে ভাই। গ্রামের কাছাকাছি এক জঙ্গলে লাশ ফেলে এসেছিল। ভেবেছিল কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু স্থানীয়

লোকজন জঙ্গলের মধ্যে মহিলার লাশ দেখে থানায় খবর দেয়। ওই মহিলার সঙ্গে বদরের ভাই আসর আলির যে আশনাই ছিল, সকলেই জানত। অগত্যা আসরের খোঁজ পড়লে দেখা গেল, সে বেপাত্তা হয়েছে। বদর এই ব্যাপারে জড়িত নয়। তবু পুলিশ কম হ্যারাস করেনি। বদর তারপরেই গ্রাম ত্যাগ করে। রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে আসে কলকাতায়। সে এক দিন গেছে ওর।

মনে ভয় আছে বদরের। সেই মহিলা, যার সঙ্গে আসরের প্রেম ছিল, তাকে আসর খুন করেছে কি না বদরের জনার উপায় নেই। কিন্তু মহিলার স্বামী আসরকে না পেয়ে বদরকে হুমকি দিয়েছে— হাতে পেলে কাটা মুন্ডু নিয়ে নাকি ফুটবল খেলবে। বদর ভয়ে রাতের অন্ধকারে জোয়ারু গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। পরে অনেক ভেবেচিন্তে ওর মনে হয়েছে, মহিলার স্বামীই যে হত্যা করেনি, তার কী প্রমাণ? অথচ মৃতার হাতের মুঠোয় আসরের গলার তাবিজ ছিল। আসরের নাম লেখা তাবিজ মৃতার হাতের মুঠোয় এল কী করে? বদর সেটা নিয়ে ভেবেছে। আসরের সঙ্গে খুনের দু'দিন আগে থেকে দেখা হয়নি বদরের। আসর আলি ডায়মন্ডের কোন হোটেলে নাকি কাজে ঢুকেছিল। ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তারপর ফোনে যোগাযোগ করেছে বদরের সঙ্গে। গ্রামে যে হুলুস্থূল পড়েছে সেটা ভাইকে জানিয়েছে বদর। মনে মনে কেন যেন বিশ্বাস করতে চেয়েছে যে আসর খুন করেনি। খবর পেয়ে আসর আলি গ্রামেই ঢোকেনি।

এদিকে বদর সোনারপুরে গোবিন্দ সাহার কাছে প্রথমে কাজ পায়। যদিও ওর সম্পর্কে গোবিন্দ সাহা খোঁজখবর করেনি বলেই মনে করে বদর। যদি খোঁজ করত, তাহলে কি আর কাজে বহাল করত? আসরের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে। আসর কোনোভাবে সংযোগ রাখেনি ভাইয়ের সঙ্গে। দুই ভাই ছিটকে পড়েছে লুটের বাতাসার মতো।

এখন ডায়মন্ডের অফিস রুমে বেঞ্চে শুয়ে পড়ার মুহূর্তে চেয়ারের দিকে নজর পড়ল বদরের। সেই চেয়ার! বদরের সামনে। নিঃশব্দে দেখছে বদরকে। যেন ডাকছে, 'আয় বদর, আমার কাছে আয়! একবার ছুঁয়ে দেখ আমাকে!'

বদরের তীব্র লোভ হল। একবার টাচ করা যায়? আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল ও। চেয়ারের হাতলে আঙুল ছোঁয়াল। কী নরম, আহা! বদর আস্তে আস্তে চেয়ারের গদি স্পর্শ করল। কখন বসেছে চেয়ারে, ওর মনে নেই। এক অদ্ভুত আবেশে আবিষ্ট হয়ে আছে বদর। তখনই চমকে উঠেছে গোবিন্দ সাহার গলার আওয়াজ পেয়ে। ঘরের মধ্যে গোবিন্দ সাহা দাঁড়িয়ে বদরকে দেখছে।

মুখে ব্যঙ্গাত্মক হাসি টেনে সাহা বলল, "ওই চেয়ারে বসতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় রে, বদর। তুই কাল থেকে আর কাজে আসিস না। তোকে হিসেব বুঝিয়ে দেব কাল। তোর ছুটি হয়ে গেল। এবারে চেষ্টা করবি এই রকম চেয়ার কিনতে পারিস কি না।"

সে অপমান ভুলতে পারেনি বদর। সোনারপুর ছেড়েছিল। সোজা কলকাতায়। জোয়ারু গ্রামেও আর যায়নি। সাহার কাছেও নয়। চেয়ারের অহংকার দেখায় সাহা? বদর কি পারবে না একটা চেয়ার কিনতে নিজের জন্য?

কবে কলকাতায় এসেছে, কবে একখানা ছোট্ট পান-সিগারেটের দোকান দিয়ে বসেছে, নিজেরই মনে নেই। সাতেপাঁচে থাকে না বলে ভালোই আছে।

চৌমাথার মোড়ে নিজের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বদর আলি। একটা ফোন আসতেই স্ক্রিনের দিকে তাকাল। ফোনটা রিসিভ না করেই কেটে দিল। পরে নিজেই অন্য একটা নম্বরে অন্য কাউকে ফোনে জানিয়ে দিল, বাইকটা আসছে, এসে পড়বে মিনিট দশেকের মধ্যে।

মিসড কলটা এসেছিল একটা বাইকের রওনা দেওয়ার খবরটা জানাতে এবং বাইক ঠিক দশ মিনিটের মধ্যেই যে এসে যাবে, সেই ইশারা ছিল মিসড কল দিয়ে। এখন পুলিশের তদন্তের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সাবধান হতে হচ্ছে। অপরাধ হলেই সন্দেহভাজনের কললিস্ট চেক করা হয়। সুতরাং যত কম ফোন করা হয়, তত ভালো।

ফোন করেই বদর আলি দোকানের পানের ঝুড়িগুলো একসঙ্গে গুছিয়ে নিল। নিয়ে দোকানের পেছনের সরু গুমটি ঘরে নিয়ে রাখতে শুরু করল। একসঙ্গে আট থেকে দশখানা ঝুড়ি নিতে পারে মাথায়। দ্বিতীয়বার গুমটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ফের ঝুড়ি তুলে মাথায় বসাতে যাচ্ছে, অমনি মাথায় পেঁচিয়ে রাখা গামছাটা খুলে গেল। গামছা পেঁচিয়ে মাথায় পাক দিতে দিতে দেখল গোটা সাতেক লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে। কয়েক জন বাদে সবই অচেনা। জড়ো হয়েই লোকগুলো ছড়িয়ে পড়ল এধারে-ওধারে। কেউ গেল গলির মুখে। কেউ বড়ো বিল্ডিংগুলোর আশেপাশে। বদর ঝুপ করে বসে পড়ল ঝুড়িগুলোর আড়ালে। ঠিক তখনই বদরের কাছাকাছি দু'জন এসে দাঁড়াল। বদরকে দেখতে পায়নি। দেখার চেষ্টাও করেনি। এদের প্রত্যেককে চেনে না বদর। জনা তিনেককে চেনে। একটা খবর আছে। একটি বাইক আসছে পিয়ালির দিক থেকে। বাইক

তালতলা মোড় থেকে একজনকে তুলবে। তারপর সোজা এদিক দিয়ে চলে যাবে বেলেঘাটার দিকে। অবশ্য 'এদিক'-এ এসে আর বেলেঘাটার দিকে যাওয়া হবে কি না, সেটা বাইকের আরোহী জানে না। বদর ঝুড়ির আড়ালে বসে থাকল। এখন উঠে দাঁড়ালে লোকগুলোর নজরে পড়ে যাবে। ওর যতটা কাজ ছিল, করে দিয়েছে। বাকি কাজের সময় থাকা উচিত নয়। কখন কী হয়ে যায়, কে তার দায় নেবে?

রাস্তাটা নির্জন হয়ে আছে এই মুহূর্তে। রাত দেড়টা। খানিক দূরের রেস্তোরাঁ রেড কিচেন-এর সামনে নির্বিকল্প সমাধি নিয়ে ঝুলে আছে কয়েকটা চিনে লণ্ঠন। ভেতরে লোকজন আছে। বাইরে কেউ নেই। কেবল বিরিয়ানির হাঁড়িটা লাল কাপড় মুড়ে চুপচাপ বসে আছে উঁচু টেবিলের ওপরে। দুটো কুকুর রাস্তার ওপর শুয়ে ছিল। ওরা বাইকের আওয়াজ পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে চক্রাকার আলোর ছুটে আসা দেখতে দেখতে সরে যাচ্ছে কি, লোকগুলো পজিশন নিয়ে নিল। বাইক রাস্তার মাঝখানে আসতেই বাইকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। বাইক চালাচ্ছে মনোহর। ও ব্রেক কষল। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েই কোমরে হাত দিয়ে রিভলভার বের করতে যাচ্ছে, আর অপেক্ষা করেনি লোকগুলো। দ্রুত চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে বৃত্ত ছোটো করে এনেই চাকু চালিয়ে দিল গলা লক্ষ করে। বাইকের পেছনে বসা আমেদকে বাধা দেওয়ার সুযোগ দিল না কেউ। আমেদ নিজেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। ওকে ঠেলে বাইক থেকে নামিয়ে দুটো রদ্দা মেরে পাশের ঢালু জমিতে ফেলে দিয়েছে লম্বা লোকটি। সে গড়াতে গড়াতে কোথায় পড়ল কেউ দেখতে যায়নি। মনোহরের গলার নলি কেটে দিতে তার শরীরটা কাঁপছিল থরথর করে। বাইক থেকে টেনে নামিয়ে আনা হল মনোহরের অর্ধমৃত শরীরটা। মৃত্যু নিশ্চিত করতে পরপর দুটো গুলি করা হল।

গুলির শব্দে রেড কিচেনের লোকজন উঁকি দিতে শুরু করেছিল। সকলের চোখের সামনে থেকে ধীরস্থির ভাবে ভালো করে সব অবজার্ভ করে গলিতে ঢুকে গেল লোকগুলো। হাতে উদ্যত রিভলভার দেখে কারও এগিয়ে আসার মতো সাহস হল না। চারপাশে অদ্ভুত নৈঃশব্দ নেমে এল। এক এক করে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে লোকজন। পুলিশকে খবর দিয়েছে কেউ। বদর দাঁড়াল না। সাক্ষী হতে গেলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। মনোহরকে কে না চেনে! দাগি আসামি। বদর ঝুড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে ঝুপ করে গুমটি ঘরে ঢুকে পড়ল। আজ আর বাইরে বের হওয়া নয়। যা হবে, কাল দেখা যাবে। এখানে বদর ছিল না। বদর কিছু দেখেনি। কিচ্ছু জানে না।

সারারাত ধরেই পুলিশের গাড়ি, লোকজনের কথাবার্তা চলল। ভোরের দিকে সব শুনশান হতে বদর দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ভাবতে বসল। যা হল, বদরের পরিশ্রমের টাকাটা আজ দুপুরের মধ্যে এসে যাবে, এটা ঠিক আছে। পুলিশের এবং লোকজনের কথাবার্তা যা শুনেছে গুমটির মধ্যে বসে থেকে, তাতে বুঝেছে বাইক চালাচ্ছিল যে, সে হল মনোহর। পেছনে ছিল আমেদ। সে বেঁচে আছে। আহত। মনোহর জাহিদ নামের কোন এক ক্রিমিনালকে খুন করেছে দু'মাস আগে। বেআইনি প্রোমোটিং-এর কারবারে ঢুকতে চেষ্টা করছিল মনোহর। যাকে খুন করেছে, তার এলাকায় ঢুকতে চেষ্টা চালাচ্ছিল। খানিকটা জায়গা দখলও করেছিল। জাহিদ ছিল মনোহরের অপোনেন্ট পার্টির লোক। সে বাধা দিচ্ছিল বলে মনোহর জাহিদকে সরিয়ে দিয়েছিল। এখন তাই এইভাবে মনোহরকে সরিয়ে দেওয়া হল। প্রতিশোধ এবং ব্যাবসায় বহিরাগতকে ঢুকতে না দেওয়াই হল এই খুনের উদ্দেশ্য। কিন্তু মূল ঘটনাটার মাথা কে বা কারা, আন্দাজ করলেও প্রমাণ নেই। রাস্তায় পড়ে আছে মনোহরের রক্তের ছিটে। সেখানে জল ঢেলে দিল কেউ। এরপর সারাদিন ধরে কত গাড়ি যাবে এর ওপর দিয়ে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মনোহরের চিহ্ন মুছে যাবে। বাইকে চেপে দু'জন এসে বার তিনেক ঘোরাঘুরি করল এলাকা দিয়ে। তারপর হুড়হুড় করে চলে গেল যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে। এরাই রাতে এসেছিল। চিনতে পেরেছে বদর। নির্বিকার মুখে পান বানাতে বানাতে রাস্তার দিকে চোখ রেখেছিল। বাইকের আরোহীদের দেখেছে। চেনা মুখ। ওরা কি জানে না যে সিসি ক্যামেরা চেক করা হয়েছে? পুলিশ এখন ওদের দেখলেই ধরবে। ওরা জানে। কিন্তু পেছনে বড়ো মাথাটি সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে বলে ভয় নেই ওদের।

ঠিক দুপুরের দিকে কালো চশমায় চোখ ঢেকে লোকটা এল। এসে হঠাৎ করে বদরের গালে কষে চড় মারল। বদর চড় খেয়ে বোকা হয়ে গেল। কে লোকটা? বদরকে মারল কেন? লোকটা বিশ্রী হেসে একটা দু'হাজারের নোট রেখে চলে গেল। বদর উঁকি মেরে দেখল, দূরে বাইক রেখে এসেছিল লোকটা। ফোনের খবর জানিয়ে দেওয়ার জন্য এই টাকাপ্রাপ্তি। বদর খানিকক্ষণ রাস্তার মাঝখানে যেখানে মনোহরের লাশ পড়ে ছিল, সেদিকে তাকিয়ে থাকল। দু'হাজারের নোটটা ক্যাশে রেখে উঠে দাঁড়াল। দোকান বন্ধ করছে দেখে পাশের গ্রসারির দোকানি শিবলাল জিজ্ঞেস করেছে, "দোকান বন্ধ করছ কেন, বদর?" বদর বলল, "শরীর ভালো নেই। ঘুমাব। জ্বর আসছে মনে হচ্ছে।"

কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না

হিমেল টিভির খবর থেকে চোখ সরিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল। আজ ভোরে একচোট বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে রাস্তায় লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের বাড়িটা মেইন রোড থেকে একটু ভেতরে হলেও রাস্তার জোরালো পরানকথা কানের ভেতর দিয়া মরমে পশিতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না। ভোর থেকে পার্থিব দুনিয়ার জেগে ওঠার শব্দ শুনতে পায় ও। পাশ ফিরে শুতে শুতে বুঝতে পারে আর একটা দিন শুরু হল। বুঝতে পারে বাতাসে বুনোফুলের গন্ধ ভাসছে। তিনি দেখছেন নিজের হাতে তৈরি দুনিয়াটাকে। হিমেল ভাবে, কী ভাবেন ঈশ্বর? ভাবেন, কী বানিয়েছিলাম, আর কী হয়েছে!

মৃদু হাসি হিমেলের ঠোঁটে লেগে থাকতে থাকতে ও ফের ঘুমিয়ে পড়ে। টিভি নিজের খুশিতে চলতে চলতে দুনিয়ার খবর নিয়ে হামলে পড়েছে। হিমেল জানে, এরপর রোদ উঠবে। পারুলদি আসবে দরজায় নক করতে। হাতে চা নিয়ে নয়, পারুলদি ঘর সাফসুতরো করতে আসবে। তখন ওয়াশরুমে ঢুকে পড়বে হিমেল। এরকমই রোজের রুটিন। কোথাও কোনো অসুবিধে নেই। অথচ হালকা হলেও কোথায় যেন একটা হলুদ ওড়না উড়ে এসে মুখের ওপরে পড়ে। আবেশে চোখ বুজে আসে। ও কেন সেদিন হলুদ দোপাট্টা উড়িয়ে হেঁটে গিয়েছিল ওর সামনে দিয়ে? কেন... কেন...? সাইড ফেসটা মনে পড়ে শুধু। সেই কবে দেখেছে, আর দেখাই হল না। কোথায় যে থাকে মেয়ে! মাঝে মাঝে বাতাস তার ওড়নার ঝাপটা নিয়ে আসে। বাতাসে ভর করে ওড়নাটা দুলে উঠেই ভেসে যায়। হিমেল কেঁপে ওঠে ভেতরে ভেতরে। এরকম কেন হয়? আগে কখনও হয়নি! শ্রেয়ার মতো সুন্দরীকে দেখেও হয়নি। তাহলে?

চোখ বুজে থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে হিমেল। রাস্তায় অনেক দূর থেকে কে যেন কী বলতে বলতে আসছে। উৎকর্ণ হয়ে ওঠে হিমেল। আওয়াজটা ক্রমেই কাছে আসছে। ততক্ষণে আওয়াজটা চিনে ফেলেছে হিমেল। দীপু পাগলা। আজ একটু বেশি তাড়াতাড়িই বের হয়েছে যে! ওর বের হওয়ার সময় হল রাত এগারোটা। আর বাড়ি ফেরার সময় হল ভোর পাঁচটা। আজ বিকেলেই বেরিয়েছে কেন?

উঠে জানালা খুলে দেখল হিমেল। অল্প অল্প বৃষ্টি শুরু হয়েছে ফের। বৃষ্টির মধ্যেই কী একটা বলতে বলতে চলে যাচ্ছে দীপু। ও নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছে সম্ভবত। নিজের বাড়ি বলতে কী'ই বা আছে! ওর বাবা মরেছে সেই কবে। মা বেঁচে আছে। কিন্তু অসুস্থ। কখনও কখনও দেখেছে হিমেল, ওদের বাড়ির দরজার সামনে দীপুর মা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দীপুর জন্য অপেক্ষা করে আছে। কে জানে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে! দীপু ভোরে ফেরে জেনেও সারারাত মা দাঁড়িয়ে থাকে। কীসের জন্য অপেক্ষা তাহলে? ভয়? আধপাগলা ছেলেটার জন্য ভয় আছে মায়ের। লোকে হেনস্থা করে। ছুতোনাতায় মারে। নাস্তানাবুদ করে মজা দেখে। ছেলের জন্য আশঙ্কা থেকে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে মনে করে ছেলের কাছাকাছিই আছে। হয়তো!

কী একটা বলছে দীপু। বোঝার চেষ্টা করতেই গলা বাড়িয়েছিল হিমেল। আর তখনই মুখ তুলে ওকে দেখে ফেলল দীপু। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল, "এই যে, ঠান্ডাবাবু। আপনার পাখি যে ভাগল বা!"

হিমেলের পিঠ বেয়ে একটা সরু সাপ সড়সড় করে নেমে যাচ্ছিল। কার কথা বলছে দীপু? ভাগল বা? মানে, পালিয়েছে? কে পালিয়েছে?

কিছু বলার কথা মাথায় এল না। দীপু হে হে হেসে যাচ্ছে। হাসতে হাসতে দুলছে, "এই যে, শুনেছিস তো ফার্স্ট খবরটা? এবারে শুনবি দু'নম্বর খবরটা? বলব না। বলব না। আরে, ওই যে ফ্যাক্টরিটা, তার ভেতরে কাল...!" কথা শেষ হল না। একটা দ্রুতগামী গাড়ি এসে উড়িয়ে দিল যেন দীপুকে। দীপুর শরীরটা ছিটকে গিয়ে পড়ল অনেকটা দূরের মিশিরজির গ্যারাজের দেয়ালে। শব্দটা শুনতে পেল হিমেল। দীপুর মাথা ফেটে গেল? ওর বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখদুটো দেখেছে হিমেল। কী হল এটা?

স্থবির হয়ে যাওয়া কাকে বলে বুঝতে পারছিল হিমেল। দীপুকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল গাড়িটা? কেন মনে হচ্ছে ইচ্ছে করে মেরে দিয়েছে? হিমেল দেখেছে রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিল দীপু। হিমেলের দিকে মুখ উঁচু করে কথা বলছিল। একটা খবর দিতে চেয়েছিল। ফ্যাক্টরি নিয়ে কী একটা বলতে চেয়েছিল। গাড়িটা কি ইচ্ছে করেই মেরে দিল? ওকে ফলো করেই আসছিল গাড়িটা? কে ছিল গাড়িতে? হিমেল খেয়ালই করেনি। আসলে ওর মন ছিল দীপুর দিকে। জানালা দিয়ে রাস্তার সামান্যই দৃষ্টিগোচর হয়। ও দীপুর কথাগুলোতে মগ্ন ছিল। দীপু হিমেলের দিকে তাকিয়ে পাখি 'ভাগল বা' বলায় হিমেল অবাক হয়ে গিয়েছিল। খেয়াল করেনি দীপুর পেছনের গাড়িটাকে।

কিন্তু এত দ্রুত গাড়িটা কোনদিকে গেল? হিমেল নীচু হয়ে রাস্তা দেখার চেষ্টা করতে গিয়েই বহু লোকের চ্যাঁচামেচি শুনতে পাচ্ছিল। দীপুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লোকজন। এদিকে প্রচুর গুদাম আছে। পাট থেকে শুরু করে লোহার রড, চাল...। গুদামে মাল মজুত হচ্ছিল। লোকজন রয়েছে রাস্তায় এই মুহূর্তে। হিমেল নিজেকে সোমে আনতে আনতে চিন্তা করল। ওর যাওয়া উচিত। কিন্তু মাথা ঘুরছে কেন!

দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে টেবিলের ওপর থেকে জলের বোতল নিয়ে অনেকটা জল গলায় ঢেলে দিল হিমেল। চোখের সামনে একটু আগে ঘটে যাওয়া পুরো ছবিটা নেচে উঠল। দীপু দুটো কথা বলেছে। নাকি দুটোরই অর্ধেক বলেছে? একটা হল, পাখি ভাগল বা। অন্যটা হল, কাল ফ্যাক্টরিতে...।

পাখিটা কে এবং পাখি ভাগল কোথায়? এটা একটা বড়ো প্রশ্ন। আর, কী হবে আজ ফ্যাক্টরিতে?

হিমেল শুনতে পাচ্ছে প্রবল চিৎকার-চ্যাঁচামেচি হচ্ছে রাস্তায়। ও দ্রুত দরজার দিকে এগোচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে মাশুকা উঠে আসছে। চোখে কান্না থিরথির করছে। হিমেলকে দেখে সামলাতে পারল না, "হিম, দীপু পাগলাকে একটা গাড়ি চাপা দিয়েছে! ও মরে গিয়েছে ঠিক। কী রক্ত! আমার শরীর কেমন করছে!"

হিমেল মাশুকার ভয়ে বিস্ফারিত চোখ দেখতে দেখতে সামলাতে চেষ্টা করল, "আরে, বস এখানে। দীপু পাগলা নিশ্চয়ই মরে যায়নি। আহত হয়েছে ঠিক। এত ভয় পেলে কি চলে?"

মাশুকা ফোঁপাচ্ছিল। ও রক্ত দেখে ভয় পায়। হিমেল নিজের মধ্যে একটা অদ্ভুত রকমের বেসামাল ভাব অনুভব করছিল। দীপুর ওপরের দিকে তাকিয়ে হেসে কথা বলার ছবিটা স্পষ্ট ঝুলে আছে চোখের সামনে। তবু মাশুকাকে সামলাতে ও হাসার চেষ্টা করল, "আরে তুই নাকি ফরেনসিক সায়েন্স নিয়ে পড়বি? মারাত্মক একটা বিষয় যেখানে রক্ত দেখা প্রায় মাস্ট। কী করে পড়বি?"

মাশুকা চোখের জল মুছে নিল হাতের উলটোপিঠ দিয়ে, "মনখারাপ করে না বুঝি? কবে থেকে চিনি দীপু পাগলাকে। কে মেরে দিল বল তো, হিম!"

মাথা নাড়ে হিমেল, "জানি না। হয়তো অ্যাকসিডেন্ট। মেরে দেবে কেন? দীপু কার কী ক্ষতি করেছে? ওকে মেরে কার কী লাভ?"

ক্রিমিনোলজি বা ফরেনসিক সায়েন্স নিয়ে পড়তে আগ্রহী মাশুকা ক্রাইম থ্রিলারের ফ্যান। ও দীপুর অ্যাকসিডেন্টকে খুন বলে ভেবে নিচ্ছে।

হিমেল নিজেও কি নিচ্ছে না? একবার বাইরে বেরিয়ে দেখা যাক লোকে কী বলছে। প্রত্যক্ষদর্শী নিশ্চয় আছে। রাস্তায় এত লোক থাকে। কেউ কি দেখেনি গাড়িটাকে? গাড়ির নম্বর কেউ দেখেছে কি? এখন কি মাশুকাকে নিয়ে বের হবে? ওর ভয়টা কাটানো দরকার। মাশুকা বড্ড ভিতু। ওর ভেতর থেকে ভয়টাকে বের করে দূরে ফেলে দিতে হবে।

মাশুকা রাজি হল না। হিমেলও জোর করল না। আগে ও নিজে গিয়ে দেখে আসুক। পরে দেখা যাবে। রক্তাক্ত চেহারার দীপুকে দেখে মাশুকা অসুস্থ হয়ে পড়লে ঝামেলা বাড়বে। এখন হিমেলের অনেক কাজ।

পারুলদি রুম ফ্রেশনার নিয়ে উঠে আসছিল। ঘর সাফসুতরো করে হালকা করে ফ্রেশনার স্প্রে করে দেয় রোজ। আজ দরকার অবশ্যই। হিমেল বাতাসে রক্তের গন্ধ পাচ্ছে।

২

চৌধুরী গ্যারাজের পাশের গলি দিয়ে খানিকটা গেলেই মোতিচুর কলোনি। অনিকেতা সুশীলকে বলেছিল গাড়িটা গলির ভেতরে না ঢোকাতে। এর আগে একবার গাড়ি ঘোরাতে খুব অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল সুশীলকে। সুশীল হরিমন্দিরের অপোজিটে গাড়ি পার্ক করল। রাস্তার সাইডে কাঁচা ড্রেন। বিশ্রী গা-গোলানো গন্ধ উঠে আসছে ড্রেন থেকে। অনিকেতা মাস্কটা নাকের ওপরে টেনে ওঠাল। সায়নার কাছে আসতে হল ফের। অনেকগুলো ব্লাউজ করতে দিয়েছে। দুটো নাইটিও। শরীর সামান্য পৃথুলা বলে সায়নাকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নেয় পোশাক। ফ্রি-সাইজ কুর্তা বা নাইটি মার্কেটে পাওয়া যায়। ব্লাউজের ক্ষেত্রে অসুবিধে আছে। আজকাল ডিজাইনার ব্লাউজের খুব চাহিদা। ইচ্ছে করে দারুণ ডিজাইনের ব্লাউজ পরতে। সায়নার হাতও চমৎকার। এমন ফিটিংস, নিজেই নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় অনিকেতা।

গাড়ি থেকে নেমে অল্প হেঁটে গলির ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। বেশ অন্ধকার গলি। এদিকে আলো দেয় না কেন? সরু গলি। সাইডে কাঁচা ড্রেন। দু'পাশে বেড়ার বাড়িগুলোতে গুচ্ছের ভাড়াটে। ঝগড়াঝাঁটির আওয়াজ, মদ্যপের গালাগালি, বাচ্চাদের কান্না শুনতে পায় অন্যদিন। আজ শুনতে পাচ্ছিল না। চারপাশে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে গেল অনিকেতা। ডানদিকের ছোটো বাড়িটা সায়নাদের। ভেতরে আলো জ্বলছে। বেশ চুপচাপ বাড়িটা আজ।

অনিকেতা একটু দাঁড়াল। সায়নাদের বাড়িতে কেউ নেই নাকি? ফোন করে আসা উচিত ছিল। একটা ফোন করে নেবে? সে'ই ভালো।

রিং হচ্ছে। ফোনে সায়নার গলা ভেসে এল, "হ্যাঁ দিদি, বলুন। আসবেন আজ?"

"হয়ে গেছে? আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।" অনিকেতা ফোনটা রেখে দিয়ে গলা তুলে বাড়ির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। পর্দা সরিয়ে সায়না আসছে মনে হচ্ছে। চটিতে পা গলাচ্ছে। কাকে যেন কী বলল।

অনিকেতাকে দেখে অল্প হাসল সায়না, "আসুন, দিদি। আপনার অর্ডারের কাজ কমপ্লিট হয়েছে।" বলতে বলতে টিনের শিটের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢোকার সুবিধে করে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। অনিকেতা বাড়ির ভেতরে পা রেখে সামনের দিকে তাকাল। উঠোনে আলো নেই। দুটো ঘরের সামনের একচিলতে বারান্দায় ঘরের ভেতরের অল্প আলো ছিটকে এসে পড়েছে।

বাড়িতে কি কেউ নেই? কথাবার্তার আওয়াজ আসছে না। অন্যদিন সায়নার কাকা, বাবা, বোনের দেখা পাওয়া যায়। আজ কেউ নেই নাকি?

সায়না ঘরে নিয়ে চেয়ার টেনে বসতে দিল। অনিকেতা প্রশ্নটা করাতে সায়না বলল, "আসলে বোন কাল থেকে বাড়িতে ফেরেনি, দিদি। খোঁজাখুঁজি চলছে। কলেজে গিয়েছিল। তারপরে আর ফেরেনি। খুব ঝগড়া করে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিল। বলেছিলাম নেক্সট মাসে দেব, এমাসে পারব না। শুনে রেগেমেগে বেরিয়ে গেল। একজন বয়ফ্রেন্ড জুটিয়েছে। সেটাই মনে হয় ব্রেনওয়াশ করেছে বোনের।"

অনিকেতা চিন্তিত চোখে তাকাল সায়নার দিকে। যথেষ্ট সুন্দরী সায়না। সৌন্দর্যের মধ্যে দৃঢ়তা রয়েছে। সায়না মুখ নীচু করে অনিকেতার ব্লাউজগুলো ভাঁজ করে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল প্যাকেটের মধ্যে। মুখে কথা নেই। ও কিছু ভাবছিল। একটু অন্যমনস্ক।

অনিকেতা বলল, "খুবই চিন্তার বিষয়। পাড়াটাই কেমন চুপচাপ লাগল আমার। তোমরা থানায় জানাওনি?"

"জানিয়েছি। পুলিশ এসে পাড়ার লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। যুবক যে কয়জন আছে, তাদের ধমক-টমক দিয়েছে। সেইজন্য পাড়ার লোকজন আজ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। আমাদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলছে না। এদিকে সন্ধে পেরিয়ে যাচ্ছে। আজও কি আসবে না ও? বুক ভয়ে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে দিদি। কী যে করব!"

অনিকেতার হাতে প্যাকেটটা দিতে দিতে সায়না বলল, "যা হওয়ার

হবে দিদি। একটা ফোন করেনি। আমি ফোন করেছি। সুইচ অফ বলছে। ও নিজের ভাগ্য নিজেই বেছে নিয়েছে। আমরা আর কী করতে পারি!"

ব্যাগ খুলে টাকা বের করে দিল অনিকেতা। কী করা উচিত বুঝতে পারছে না। সায়নাদের বাড়ির অবস্থা উপলব্ধি করতে পারছে ও।

সোশ্যাল মিডিয়ায় কি জানানো যাবে ব্যাপারটা? কেউ যদি দেখে থাকে সায়নার বোনকে?

সায়না মাথা নাড়ে, "না, দিদি। ব্যাপারটা চাউর হয়ে গেলে ওর খারাপ হবে। ওরা যদি বিয়ে করে থাকে, আমরা মেনে নেব। কিন্তু সেকথাটা জানাতেও পারছি না। কী করে জানাব বলুন?"

সুশীল বাইরে থেকে ডাকল। অনিকেতা সায়নার দিকে তাকাল, "আমি পরে রাতের দিকে তোমাকে ফোন করব। কোনো প্রয়োজনে লাগতে পারলে খুশি হব। দেখো।" প্যাকেটের ভেতরে উঁকি দিয়ে গুনে নিল অনিকেতা। ছ'টা ব্লাউজ। দুটো সালোয়ার কামিজ। সামনেই ঋকের বিয়ে। গোছগাছ করা থাকলে অসুবিধে হয় না।

সুশীল অনিকেতার দেরি দেখে ডাকতে এসেছে। মিনিট খানেক আগেই পুলিশের গাড়ি চলে গেল এদিক দিয়ে। এদিকে আবার আসবে কি না কে জানে। অজানা কারণে পাড়াটা থম মেরে আছে।

সুশীল ভয় পেয়ে ডাকতে এসেছে। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া ভালো। অনেকদিন ধরেই দেখছে ও। পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ। কখন যে ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে, কেউ বলতে পারে না।

গাড়িতে উঠে বাইরেটা দেখল অনিকেতা। সুশীল বলল পুলিশের কথাটা। অনিকেতা একটা "হুঁ" করে চুপ হয়ে গেল। রাস্তায় লোকজন খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না। কোভিডকালে মানুষ বড্ড একা হয়ে গেল। কী করে কী করে যেন ডিপ্রেশন ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ছে ভাইরাসের মতো। কেউ কারও সঙ্গে মেলামেশা করে না। সবাই বড়ো একা হয়ে যাচ্ছে। গিয়েছেও। মাঠে ছেলেপিলেদের হই হই আওয়াজ ঘাসের ভেতর থেকে সবুজ শব্দ হয়ে উঠে আসে না। এ'ই কি জীবন? এভাবেই মানুষ যান্ত্রিক হয়ে যেতে যেতে একদিন আর কথা বলতে পারবে না। মূক, বধির হয়ে যাবে।

গাড়ি রাইট টার্ন নিতেই রাস্তায় ফের পুলিশের গাড়ি দেখল সুশীল। স্পিড কমিয়ে মিরর গ্লাসে অনিকেতাকে দেখল। একটু চুপচাপ অনিকেতা আজ। কিছু ভাবছে। অন্যদিন প্রচুর কথা বলে। আজ অন্যরকম লাগছে।

সুশীল একটু গলার আওয়াজ করল, গলাখাঁকারি যাকে বলে। অনিকেতা অলস চোখে উইন্ডস্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে এখন। সুশীল অনিকেতাকে